ঘণ্টা খানেক পর রহমতের ফোন এলো। মিজান তখনও সাহস করে বাসার ভেতরে ঢোকে নি। সে শেডের মধ্যে ঢুকে এটা সেটা নিয়ে অযথা নাড়াচাড়া করছে। জুলেখা কিংবা চাঁদনী – মেয়েটি যেই হয়ে থাক, তার রাগ কতখানি পড়েছে কে জানে। তাছাড়া ব্যাপারটা যতক্ষন না তার নিজের মাথার মধ্যে একটু খোলাসা হচ্ছে, ততক্ষণ সে একটু একা একা থাকতে চায়। রহমতের সাথে আলাপ করতে পারলে অন্তত একটু ভালো লাগত। সে মিজানের চেয়ে অনেক চটপটে, সব ব্যাপারেই কখন কি করতে হবে জানে। তার ফোন পেয়ে একটা অসম্ভব স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল মিজান। শেডের দরজাটা ভালো করে ভিড়িয়ে দিয়ে ফোনটা ধরল।

"রহমত!" এক রকম ফিসফিসিয়ে উঠল সে।

রহমত অবাক কণ্ঠে বলল, "ঘটনা কি রে? এমন সিরিয়াস মেসেজ রেখেছিস কেন? এখন আবার এমন ফিসফিস করে কথা বলছিস। সব ঠিক আছে তো?"

মিজান অকারণেই দরজার দিকে তাকাল। "শোন, তোর সাথে আমার দেখা করা দরকার। খুব সিরিয়াস ব্যাপার।"

"একটু খুলে বল না। কি ব্যাপার? সমস্যাটা কি?"

"সমস্যাটা জুলেখাকে নিয়ে," মিজান গলা নামিয়ে বলল। "সব খুলে বলতে পারছি না এখন। তুই যদি ফ্রি থাকিস, তাহলে তোর বাসায় চলে আসি?"

"এখন?" রহমত এবার সত্যিই অবাক হয়েছে। "সাংঘাতিক কিছু হয়েছে মনে হচ্ছে। তোকে তো হাত পা ধরেও আনা যায় না।"

মিজান বিরক্ত কণ্ঠে বলল, "তুই কি বাসায়? আমি আসছি তাহলে।"

"আয়। আমার তো কোন অসুবিধা নেই। দুপুরে খেয়েছিস? আমার সাথে খাস।"

"তোর রান্না আমার মুখে রোচে না। তাছাড়া ক্ষিধে নেই। আসছি। সব খুলে বললে বুঝবি কি অসুবিধায় পড়েছি। মাথায় কিছুই ঢুকছে না।"

ফোন রেখে দিয়ে চুপি চুপি শেড থেকে বের হল মিজান। আড়চোখে উপরটা একবার দেখে নিল। জোহরাকে দেখা গেল না। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে সে তাকে লক্ষ্য করছে না। উপরের তলায় হাজার গন্ডা জানালা। কোথায় ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে আছে কে জানে? যতখানি সম্ভব নিঃস্পৃহ মুখ করে ড্রাইভওয়েতে পার্ক করা মার্সিডিজ সিডানটার দিকে এগিয়ে গেল। একটু বয়েস হয়েছে গাড়ীটার কিন্তু তারপরও দেখতে শুনতে এখনও চমৎকার আছে। নায়লা বেঁচে থাকতে একটা বি-এম-ডব্লিউ চালাত। সে মারা যাবার পর সেটা বিক্রি করে এই গাড়ীটা কিনেছে। সব কিছু নতুন করে শুরু করতে চেয়েছিল। তার প্ল্যান মনে হচ্ছে মাথা থুবড়ে পড়তে চলেছে। তার মনে হচ্ছে সে একটা ভয়াবহ ভুল করেছে। ভালো করে না জেনে শুনে একটা মেয়েকে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এক গ্রাম থেকে বিয়ে করে আনাটা একেবারেই উচিৎ হয় নি।

খুব নীরবে গাড়ীর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল মিজান। দরজাটা যতখানি নিঃশব্দে বন্ধ করা যায়, করল। চাবি বের করে গাড়ী স্টার্ট দিল। ড্রাইভ করে বেরিয়ে আসার সময় নিজের অজান্তেই তার দৃষ্টি রিয়ার ভিউ মিররে চলে গেল। মনে হল উপর তলার একটা জানালার পর্দা চকিতে সরে গেল। জুলেখা কি তাকে দেখেছে? মনের ভুলও হতে পারে। কে জানে?

রহমতের বাড়ী কাছেই। যেতে বড়জোর মিনিট দশ-পনের লাগে। বেশ পুরানো বাড়ী কিন্তু বড় সড়। অনেক গাছপালা। চারদিকে ঝোপ ঝাড় আর হাজার রকমের বুনো ফুলে এক রকম জঙ্গল হয়ে আছে। মিজানের মত রহমতের জীবনেও একটা বড়সড় ট্রাজেডি আছে। তার স্ত্রীর সাথে বছর পাঁচেক আগে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। রহমতের দোষের মধ্যে ছিল অতিরিক্ত মদ্যপান। বউ তাকে অনেক শোধরানোর চেষ্টা করেছিল। যখন কিছুতে কিছু হয় নি তখন ডিভোর্স দিয়ে বাংলাদেশে চলে গেছে। সেখানে তাদের বিরাট বাড়ী ঘর, সহায় সম্পত্তি আছে। তাদের বাচ্চা কাচ্চা না থাকায় কোন জটিলতার সৃষ্টি হয় নি। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, বউ চলে যাবার পর রহমত খুব ভেঙে পড়ে এবং মদ খাওয়া ছেড়ে দেয়। তার সময় এখন প্রধানত ব্যাবসার কাজে ঘুরে ঘুরে কাটে। আবার বিয়ে করবার কোন আগ্রহ তার কখনই ছিল না। সে নাকি একাই ভালো আছে। মিজানের মনে হয় সেও রহমতের মত একই ব্রত নিলেই ভালো করত।

মিজানের দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ মুখ দেখে বেশ অবাক হল রহমত। বন্ধুকে সে এতো ঘাবড়ে যেতে ইদানিং কালে দেখেনি। বিশেষ করে দ্বিতীয়বার বিয়ে করার পর থেকে বেশ ফুরফুরে মন নিয়েই ছিল সে। রহমত ধরেই নিয়েছিল বউ নিয়ে আসার পর তার জীবন অসম্ভব আনন্দের মধ্যে কাটবে। সুন্দরী, তরুণী স্ত্রী – বন্ধুর মন্দ থাকার তো কারণ নেই।

"ঘটনা কি?" সরাসরি প্রশ্ন করে রহমত। "তোকে দেখে মনে হচ্ছে তোর সর্বস্ব গেছে।"

মিজান লিভিংরুমে রহমতের মুখোমুখি একটা সোফায় শরীর ছেড়ে দিয়ে বসেছে। তার মাথায় ঝড়ের মত চিন্তা চলছে। কিভাবে গুছিয়ে বললে রহমত ব্যাপারটার গুরুত্ব সম্পূর্ণ বুঝতে পারবে ভাবছে সে। শেষে দ্বিধা দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে সকালের পুরো ঘটনাটা খুলে বলল মিজান। অসম্ভব ভারী গাছ এবং মেহগনী কাঠের বিশাল ড্রেসিং টেবিলটা সরানোর কথাটাও উল্লেখ করল। রহমত গম্ভীর মুখে সব শুনল। "আমার মাথায় তো কিছুই ঢুকছে না, বন্ধু। বিশ্বাস করতে পারছি না। ভাবীকে দেখে তো মনেই হয় না সে একটা ভারী চেয়ার সরাতে পারবে। তুই নিশ্চিত ভাবীই এগুলো করেছে?"

"আজ সকালের ঘটনাতো আমার চোখের সামনেই হল।"

চিন্তিত মুখে মাথা দোলাল রহমত। মিজান যে তার কাছে এসেছে শুধু বন্ধুত্বের অধিকার নিয়ে, তা নয়। এই বিয়েতে রহমত বলা চলে একরকম ঘটক হিসাবে কাজ করেছিল। সে নিজে অবশ্য জুলেখাকে চিনত না। কথাচ্ছলে এক সমাবেশে গিয়ে স্ত্রীর মৃত্যুর পর মিজানের একাকীত্বের কথা উল্লেখ করার পর, তার পরিচিত এক ভদ্রলোক জুলেখার খবর তাকে দেন। নাম ঠিকানা জানার পর রহমতই ফোনে জুলেখার নানীর সাথে যোগাযোগ করে। বিয়েতে রহমত যেতে পারে নি। তার একটা জরুরী কাজ পড়ে যায়। মিজান একাই গিয়েছিল। কোন সমস্যা হয় নি। এখন মনে হচ্ছে, ভালো করে খোঁজ খবর করা দরকার ছিল। সেই ভদ্রলোকের মুখের কথায় বিশ্বাস করে এতো বড় একটা কাজ করা ঠিক হয় নি। জুলেখার নানীর সাথে কথা বলে অবশ্য ভালোই লেগেছিল। কে জানত মেয়েটার এতো বড় একটা সমস্যা আছে? সবাই মিলে কৌশলে চেপে গেছে।

"সেই ভদ্রলোকের নামটা যেন কি ছিল?" মিজান শেষ পর্যন্ত নিজেই জিজ্ঞেস করল। এই প্রশ্ন যে উঠবে রহমত জানত। ওঠাই স্বাভাবিক।

"দৌলত মিয়া। আমার ফিফটি প্লাস ক্লাবের মেম্বার ছিলেন। ওনার দুঃসম্পর্কের ভাগ্নী হয় জুলেখা ভাবী।"
"তোর সাথে ইদানিং দেখা হয়েছে তার?" মিজান জানতে চাইল।
মাথা নাড়ল রহমত। "তাকে অনেক দিন দেখিনি। তোর আর জুলেখা ভাবীর বিয়ের পরও ক্লাবে দু একবার দেখা হয়েছে বলে মনে পড়ছে। কিন্তু গত ছয় মাসে দেখা হয় নি।"
"তার ঠিকানা, ফোন নাম্বার কিছু আছে তোর কাছে?"
"আছে। তার বাসায় আমরা দু'জনে মিলে একবার গিয়েছিলাম, মনে আছে? নানীর সাথে প্রথম যে দিন মোবাইলে কথা বললাম।"
মনে পড়ল মিজানের। প্রায় বছর দেড়েক আগের ঘটনা। মিসিসাগায় তার ভাড়া এপার্টমেন্টে গিয়েছিল ওরা দুই বন্ধু। দৌলত মিয়া ফোনে জুলেখার নানীর সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দেয় এবং বিয়ের কথা তোলে। মিজান তার সেল ফোন বের করে এড্রেস বুক ঘাঁটল। ভেবেছিল ভদ্রলোকের ফোন নাম্বারটা হয়ত তোলা আছে। খুঁজে পেল না।
রহমত তার সেল ফোনে নাম্বারটা খুঁজে পেল। সে তখনই একটা রিং দিল। ফোন বেজেই চলেছে। কেউ ধরল না। ভয়েস মেইলেও গেল না। কেটে দিল রহমত। "কেউ তো ধরছে না।"
"নাম্বারটা ঠিক তো?"
"নিঃসন্দেহে। তার সাথে আমার মোটামুটি ভালোই বন্ধুত্ব ছিল। তোর বিয়ের ব্যাপার ছাড়াও মাঝে মাঝে এটা সেটা নিয়ে আলাপ হত ফোনে।"
"আজকাল ভয়েস মেইল থাকে না কার?" বিরক্ত কণ্ঠে বলল মিজান।
"যতদুর মনে পড়ে তার তো ভয়েস মেইল ছিল। হয়ত সার্ভিস চেঞ্জ করেছে।"
"এখন কি করা যায়, একটা বুদ্ধি দে।"
মাথা চুলকাল রহমত। "জুলেখা সম্বন্ধে জানে এমন তো আর কাউকে চিনি না। আরেকটা উপায় হচ্ছে গ্রামে গিয়ে মানুষ জনকে জিজ্ঞেস করা। নানী তো আর বেঁচে নেই। বিয়ের সময় আর কে কে ছিল অনুষ্ঠানে?"
"হাতে গোনা কয়েকজন ছিল। নানী, এক দুঃসম্পর্কের মামা, নামটা ভুলে গেছি, কয়েক জন বৃদ্ধা, মনে হয় নানীর বান্ধবী বা প্রতিবেশী হবে। আর এক মৌলভি। মনে হয় স্থানীয় মসজিদে নামাজ পড়ায়।"
রহমত একটু চিন্তা করে বলল, "কেউ না কেউ নিশ্চয় কিছু জানে। তুই যা বলছিস সেটা যদি সত্যি হয়, তাহলে ব্যাপার তো খুবই রহস্যময়। সারা গ্রামের মানুষের কাছ থেকে এতো বড় একটা ব্যাপার গোপন করা সম্ভব না। "
হতাশ ভঙ্গীতে শ্রাগ করল মিজান। "এখন কি জামালপুর গিয়ে খবর নেয়া সম্ভব! আমার কাজ কর্ম আছে না? তাছাড়া জুলেখাকেই বা কি বলব? ওকে একা রেখে যাওয়াও তো সম্ভব হবে না। আর নিয়ে যাবারতো প্রশ্নই ওঠে না। কি বিপদে পড়লাম বলত? আমার এখন ওর আশেপাশে যেতেও ভয় করছে। মাইকের পেটে প্লেটটা যে জোরে মেরেছে, তুই যদি দেখতিস...মাইকতো ছোটখাট মানুষ না। একেবারে ছিটকে মাটিতে গিয়ে পড়েছে। আমি তো ভয় পাচ্ছিলাম দম বন্ধ হয়ে মারা যায় কিনা। খুনের কেসে পড়ে যেতাম।

বেচারী আর ফিরবে কিনা সন্দেহ আছে।"
রহমত হেসে ফেলল। "মাইককে নিয়ে তোর এখন না ভাবলেও চলবে। তোর বউয়ের কি করবি তাই বল।"
"সেই বুদ্ধি নেবার জন্যই তো তোর কাছে এলাম। তুই তো এখন পর্যন্ত কোন কিছুই করতে পারলি না। তোর বন্ধুর সাথে যোগাযোগ করতে পারলেও তো কিছু না কিছু জানা যেত। তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা কর না।"
"আচ্ছা আমি চেষ্টা করব। ক্লাবের কেউ না কেউ খোঁজ দিতে পারবে। তুই বেশী ভাবিস না। জুলেখা ভাবী তো আর তোর উপর ক্ষেপে নি। মাইকের উপর ক্ষেপেছে। যথার্থ কারণও ছিল। বেচারী হরিণটার পেছনে লাগার কি দরকার ছিল ওর? একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে। ব্যাটা পাঁড় মাতাল, কাম কাজের কোন ঠিক নেই। মেয়ে মানুষের হাতে পিটান খেয়ে একটু বুদ্ধি সুদ্ধি খুলতে পারে।"
"মাইকের কথা বাদ দে তো। ওকে নিয়ে কে ভাবছে? ওকে আমার কাজে লাগবে, কিন্তু বুঝিয়ে সুঝিয়ে ব্যাবস্থা করা যাবে। ওকে সহজে কেউ কাজ দিতে চায় না। টাকার গন্ধ পেলেই ছুটে আসবে। তুই বরং বল, আমার কি করা উচিৎ?"
রহমত একটু ভেবে বলল, "আমার কি মনে হয় জানিস, তুই কিচ্ছু করিস না। এমন ভাব কর যেন কিছুই হয় নি। ইতিমধ্যে আমি দৌলত মিয়াকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। পাওয়া যাবে। পেলে তখন ব্যাটাকে ভালো করে ঝেড়ে দেখতে হবে কোন তথ্য পাওয়া যায় কিনা।"
মিজান চিন্তিত মুখে বলল, "তোর কি মনে হয় ওর কোন মানসিক সমস্যা আছে? আমার কাছে মনে হচ্ছে মাল্টিপল পারসোনালিটি। গায়ের জোরের ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে পারছি না। তবে পারসোনালিটি পরিবর্তন হবার সাথে সাথে শারীরিক পরিবর্তন হয়ত হওয়া সম্ভব। তুই কি বলিস?"
শ্রাগ করল রহমত। "আমি তো আর সাইকিয়াট্রিস্ট না। আমি কি বলব? কোন সাইকিয়াট্রিস্টের সাথে আলাপ করে দেখতে পারিস।"
মাথা চুলকাল মিজান। "সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গেলে, ওকে নিয়ে যেতে হবে। শুধু আমি গিয়ে কি করব? আজকে যে ব্যবহার দেখেছি, সাহস করে বলতে পারবো না। আমি একরকম দিশেহারা হয়ে গেছি। এই রকম কিছু একটা হতে পারে আমি চিন্তাই করিনি..."
"বললাম তো, স্বাভাবিক থাক। দৌলত মিয়াকে খুঁজে বের করি। সমাধান একটা হবে।"
দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ল মিজান। "তুই তো বলেই খালাস। বাস তো ঐ বাড়ীতে আমাকে করতে হবে।"

বাসায় ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হল। বাসার ভেতরে ঢুকে দেখল জুলেখা রান্নাঘরে খুব মনযোগ দিয়ে রান্না করছে। সারা বাড়ীর সব আলো নেভানো, শুধুমাত্র রান্নাঘরের আলোটা জ্বলছে। মিজান লক্ষ্য করেছে জুলেখা খুব উজ্জ্বল আলো পছন্দ করে না। এতোদিন এটা নিয়ে সে খুব একটা চিন্তা করে নি। আজ চেষ্টা করেও মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারল না। চুপি চুপি উপরে চলে যাবার চেষ্টা করছিল, জুলেখা ডাকল।

"শুনছেন?"
নিজেকে যতখানি সম্ভব স্বাভাবিক রেখে রান্নাঘরে চলে এলো মিজান। "রান্না করছ? চমৎকার গন্ধ বেরিয়েছে। কি রাঁধছ?"
"অনেক কিছু। আপনি হাত মুখ ধয়ে আসেন। গরম গরম খেয়ে নেবেন।"
জুলেখার হাসি মুখ দেখে মনে মনে স্বস্তি বোধ করল মিজান। ভবিষ্যতে কি হবে কে বলতে পারে। আপাতত তার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা একটা করে দিন কোন সমস্যা ছাড়া যাপন করা। ভদ্র ছেলের মত মাথা দোলাল মিজান। "দশ মিনিটের মধ্যেই আসছি। একটু গোছল করতে হবে। ঠিক আছে?"
"দেরী করবেন না।" জুলেখা সহজ গলায় বলল।
দ্রুত উপরে এসে গোছল করল মিজান। নীচে আসতে আসতে আধা ঘন্টা পেরিয়ে গেল। জুলেখা ডাইনিং টেবিলে সুন্দর করে খাবার পরিবেশন করেছে। ঘরের সব আলো গুলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। চমৎকার লাগছে। মনটা ভালো হয়ে গেল মিজানের। এখন মনে হচ্ছে সকালে যা ঘটেছে সেটা হয়ত স্রেফ কল্পনা।
নিজ হাতে খাবার বেড়ে দিল জুলেখা। এটাই প্রথম। কতদিন মনে মনে এটাই চেয়েছে মিজান। আজ এভাবে কপাল খুলে যাবে কে ভাবতে পেরেছিল? মুখোমুখি বসেছে জুলেখা। সুন্দর একটা সুতির শাড়ী পরেছে। মুখে আলতো করে পাওডার দিয়েছে মনে হয়। সে এমনিতেই সুন্দর। আজ অপূর্ব লাগছে। লুকিয়ে লুকিয়ে তাকাচ্ছে মিজান। সরাসরি তাকাতে তার যেন একটু লজ্জাই লাগছে।
"কোথায় গিয়েছিলেন?" জুলেখা হঠাৎ জানতে চাইল।
"আমার এক বন্ধু ফোন দিয়েছিল," থতমত খেয়ে বলল মিজান। "ব্যাবসার কাজে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায়। ক' দিন আগে ফিরেছে, তাই দেখা করতে চাইল।"
"রহমত ভাই?"
"হ্যাঁ। তুমি চেন তাকে?" অবাক হবার পালা মিজানের।
"নামে চিনি। নানী বু'র সাথে কয়েকবার আলাপ করেছিলেন। বিয়ের আগে। নানী বু আমাকে বলেছে।" জুলেখা খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল।
মনে মনে প্রমাদ গুনল মিজান। জুলেখা কি কোন কিছুর ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করছে? হঠাৎ আজকেই কেন রহমতের সাথে দেখা করতে গেল মিজান? সে হয়ত কিছু একটা আন্দাজ করেছে।
"মাইক ঠিক আছে?" জুলেখা নীচু গলায় প্রশ্ন করল।
"মনে হয়। আমার সাথে কথা হয় নি।"
"লোকটাকে আমার পছন্দ না। মাতাল একটা! জীবজন্তুর প্রতি কোন মায়া নেই। কেমন পোষাক আষাক পরে। মনে হয় নেশা ভাংও করে। বদ লোক! ওকে ডাকবেন না।"
খুক খুক করে কাশল মিজান। মাইককে ঝট করে দেখে কারোরই পছন্দ হবে না। কিন্তু মানুষ হিসাবে সে খারাপ নয়। জুলেখাকে না ক্ষেপিয়ে সেটা কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায় সেটাই হল প্রশ্ন। এই মুহূর্তে চেপে গিয়ে পরে প্রসঙ্গটা তুললেই হবে। কিন্তু জুলেখা ব্যাপারটা চাঁপা পড়তে দিল না। "ঠিক আছে তো? ওকে আর ডাকবেন না।"
মিজান কোন উত্তর দিচ্ছে না দেখে তার কণ্ঠে কিঞ্চিত অসহিষ্ণুতা ফুটে উঠল। "কিছু

বলছেন না কেন?"
মিজান খুক খুক করে কেশে বলল, "ওকে দেখে যা মনে হয় ও তত খারাপ নয়। বিশ্বাস কর আমাকে। একটু মাতাল, স্বীকার করছি। কিন্তু কাজ কর্ম পারে ভাল। অনেক সস্তা। অর্ধেক দামে কাজ করে দেয়। অর্ধেকেরও কম। ক' দিন বাদে ছাদের কাজ করাতে হবে। ছাদটা পুরানো হয়ে গেছে। অনেক টাকার ব্যাপার।"
থমথমে মুখে ওর দিকে তাকাল জুলেখা। "টাকাটাই বড়?"
ভুলটা বুঝতে দেরী হল না মিজানের। সে তরী সামলানোর চেষ্টা করল। "অবশ্যই না। তুমি ভেব না। অন্য কাউকে ডাকব। রান্না খুব মজা হয়েছে। তুমি তো কিছুই খাচ্ছ না?"
মুখ নীচু করে কয়েক মুহূর্ত নীরবে বসে থাকল জুলেখা। তারপর ঝট করে উঠে, হাত ধুয়ে, সিঁড়ি বেয়ে উপরে শোবার ঘরে চলে গেল। নিজের উপরেই বিরক্ত হল মিজান। ব্যাপারটা ঠিকমত সামলাতে পারল না। এতো কষ্ট করে রান্না বান্না করেছিল, পুরোটাই ভেস্তে গেল। নরম গলায় কয়েকবার 'জুলেখা' 'জুলেখা' বলে ডাকল। কোন উত্তর দিল না জুলেখা। খাবার আগ্রহ চলে গেছে মিজানের। সে একাকী ডাইনিং টেবিলে চুপচাপ বসে থাকল কিছুক্ষন। শেষে উঠে হাত ধুয়ে দুই কাপ চা বানিয়ে উপরে এলো। খুব দেরী হবার আগেই সন্ধি করে জুলেখার সিদ্ধান্ত মেনে নেয়াই ভালো।
শোবার ঘরে ঢুকে ওর অবাক হবার পালা। জুলেখা সেখানে নেই। তার বালিশ এবং লেপ উধাও হয়ে গেছে। আশ্চর্য হয়ে করিডোরে বেরিয়ে এসে অন্যান্য ঘরগুলোতে খুঁজতে শুরু করল সে। নায়লার পাশের ঘরটা গেস্ট রুম হিসাবে সবসময় সাজানো থাকে। দরজায় আলতো করে চাপ দিতে বুঝল, ভেতর থেকে বন্ধ। জুলেখা সেখানে রাতের জন্য আস্তানা গেড়েছে। এটার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না মিজান। ভয়ে ভয়ে দু' বার নক করল। "জুলেখা! জুলেখা!"
কোন উত্তর এলো না। আবার নক করতে গিয়েও থেমে গেল মিজান। তাকে উত্যক্ত করাটা ঠিক হবে না। চলে আসার আগে নীচু গলায় বলল, "তুমি না চাইলে আমি মাইককে ডাকব না। সত্যি বলছি।"
এবারেও কোন প্রত্যুত্তর এলো না। মিজান চুপি চুপি নিজের ঘরে ফিরে এল। রহমতই ঠিক বলেছে। মিজানের এখন উচিৎ হচ্ছে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করা। জুলেখাকে আরোও ভালো করে না জানা পর্যন্ত চুপচাপ থাকাই ভালো।